হিস্টেরিয়া ও গণহিস্টেরিয়া
রোগ/অসুস্থতার লিঙ্গীয় নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের স্বরূপ

আইনুন নাহার ও আলোকা তালুকদার

ভূমিকা

'গণহিস্টেরিয়া' নিয়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিগত কয়েক বছর যাবৎ বেশ আলোচনা হয়ে আসছে। এটিকে আদতে গণহিস্টেরিয়া বলা হবে নাকি 'মাস সাইকোজেনিক ইলনেস/গণমনস্তাত্ত্বিক অসুস্থতা' হিসেবে উল্লেখ করা হবে এ নিয়ে যেমন বিশেষজ্ঞ মহলসহ অপরাপর মানুষজনের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে, তেমনি একে রোগ হিসেবে দেখা হবে নাকি অসুস্থতা হিসেবে বিবেচনা করা হবে তা নিয়েও একইরকমভাবে মতানৈক্য বিদ্যমান। এই নিবন্ধের সীমিত পরিসরের কারণে যদিও এই পুরো বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হচ্ছে না, তথাপি এটি উল্লেখ করবার প্রয়োজনীয়তাকেও পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া যায় না; যেহেতু গণহিস্টেরিয়া নামক 'রোগ/অসুস্থতা'র'[1] বহুমাত্রিক বাস্তবতার এটিও একটি উল্লেখযোগ্য দিক। যাহোক, আমরা মূলত একটি রোগ/অসুস্থতাকে যেভাবে লিঙ্গীয়করণ করা হয়, তার প্রেক্ষাপটে গণহিস্টেরিয়া নিয়ে এই নিবন্ধে বিস্তারিত আলোকপাত করব। উল্লেখ্য যে, গণহিস্টেরিয়া নিয়ে আলোচনার পরিসরে হিস্টেরিয়া নিয়েও কথাবার্তা বলা হয়, যেহেতু হিস্টেরিয়ার লক্ষণসমূহের ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনাটিকেই গণহিস্টেরিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এই রোগ/অসুস্থতার ঘটনা-পরিবেশনকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এতে নারীদের অধিক হারে আক্রান্ত হবার বিষয়টি উঠে আসে। ঐতিহাসিককাল থেকে এই ধরনের পরিবেশন-রীতি চলমান, যার একটা ফল হিসেবে এই রোগ/অসুস্থতাকে নারীর সাথে যুক্ত করে দেখবার প্রবণতা কম-বেশি বিদ্যমান; এবং এতে করে হিস্টেরিয়া, গণহিস্টেরিয়া এবং নারী সমার্থক হয়ে ওঠে। অথচ, বাস্তবে এ ধরনের রোগ/অসুস্থতায় পুরুষরা আক্রান্ত হন না এমনটি সত্য নয়। এই নিবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য হলো এমন একটি বাস্তবতাকে সমস্যায়িত করা এবং সেই আলোকে এ ধরনের বাস্তবতার স্বরূপকে খতিয়ে দেখা। আরো স্পষ্ট করে বললে, হিস্টেরিয়া, গণহিস্টেরিয়া এবং নারীর পরস্পর সমার্থক হয়ে ওঠার এই বাস্তবতা নতুন কিছু নয়, বরং এর একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে। সেদিক থেকে এই নিবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় হলো কীভাবে একটি নির্দিষ্ট রোগ/অসুস্থতার লিঙ্গীয়করণ ঘটে তাকে ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে তুলে ধরা এবং রোগ/অসুস্থতার প্রেক্ষাপটে সুনির্দিষ্ট লিঙ্গীয় পরিচয়ের অন্তর্ভুক্ত মানুষজনকে (নারী) ঘিরে এই লিঙ্গীয় মতাদর্শিক নির্মাণের উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়া ও তার স্বরূপকে স্পষ্ট করা।

এই দুটি বিষয়কে বিবেচনায় রেখে নিবন্ধটির সামগ্রিক আলোচনাকে দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। আলোচনার প্রথম অংশে হিস্টেরিয়া ও গণহিস্টেরিয়া এবং হিস্টেরিয়া ও নারীর পরস্পর সমার্থক হয়ে ওঠবার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে

---

[1] অনেক চিকিৎসক/বিশেষজ্ঞ হিস্টেরিয়াকে মানসিক অসুস্থতা হিসেবে দেখেছেন, কোনো রোগ হিসেবে নয়। আবার এমনটিও দেখি যে, অন্যান্য শারীরিক রোগের মতোই মানসিক অসুস্থতাকেও চিকিৎসাযোগ্য ও প্রতিরোধযোগ্য রোগ হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের ওপর গুরুত্বারোপ করবার কথাও বলা হয়েছে চিকিৎসকের তরফ থেকে। রোগ/অসুস্থতার নামকরণ থেকে শুরু করে খোদ রোগ/অসুস্থতাকে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গিতে চিকিৎসকদের মধ্যে ভিন্নতার বিষয়টি স্পষ্টত দৃশ্যমান। অর্থাৎ গণহিস্টেরিয়াকে কেন্দ্র করে চিকিৎসক/বিশেষজ্ঞদের মধ্যে 'অসুস্থতা বনাম রোগ'— এমন একটা বিতর্ক বিরাজমান, যেখানে চিকিৎসক/বিশেষজ্ঞরা সকলেই এটিকে একভাবে বিবেচনা করেন না। অন্যদিকে মাঠকর্মের সময় আমরা খেয়াল করি যে, অভিভাবকেরা একে মানসিক রোগের পরিবর্তে শারীরিক অসুস্থতা হিসেবেই দেখতে আগ্রহী, যার পিছনে আবার রয়েছে সামাজিক, লিঙ্গীয় মতাদর্শ। আমরা আমাদের মাঠকর্মের সময় যখন তাদের সাথে এই রোগ/অসুস্থতা নিয়ে কথা বলছিলাম, তখন লক্ষ করে দেখি যে, তারা এই রোগের নামকরণ করেছেন 'পইড়া যাওয়া', যেহেতু অসুস্থতার সাধারণ লক্ষণ ছিল যে সবাই পড়ে যেত। অর্থাৎ কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না। স্কুলের শিক্ষক থেকে শুরু করে অভিভাবক, আক্রান্ত, আক্রান্ত হন নি এমন শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে স্থানীয় মানুষজন সবার ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের আলাপচারিতার সময় এই বিষয়টি লক্ষ করি। আর এ কারণে আমাদের এই নিবন্ধে রোগ এবং অসুস্থতা এই দুটি প্রত্যয়কে আপাতভাবে সমার্থক রাখলেও এগুলোকে সমস্যায়িত করে দেখবার ওপর জোরারোপ করেছি। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন 'গণহিস্টেরিয়ার বহুমাত্রিকতা : গ্রামীণ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অসুস্থতার লিঙ্গীয় স্বরূপের উপাখ্যান', নৃবিজ্ঞান পত্রিকা (২০০৯)।

তুলে ধরা হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশে এই ঐতিহাসিক বাস্তবতার ধারাবাহিকতায় একটি নির্দিষ্ট রোগ/অসুস্থতায় (গণহিস্টেরিয়ায়, হিস্টেরিয়ায়) অন্তর্নিহিতভাবে বিদ্যমান লিঙ্গীয় রাজনীতি ও তার চর্চাকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নরসিংদীর আদিয়াবাদে আমাদের একটি মাঠ-গবেষণার[২] আলোকে আলোচনা করা হয়েছে। নিবন্ধের দ্বিতীয় অংশের আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা এখানে সংক্ষেপে বলে নেয়াটা প্রয়োজন বোধ করছি। হিস্টেরিয়া আর গণহিস্টেরিয়ায় নারীরাই সাধারণত বেশি আক্রান্ত হয় বলে চিকিৎসকরা যেমনটি বলে থাকেন, তা আমাদের গবেষণা-মাঠকর্মেও প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু, আমাদের পুরো কাজের প্রেক্ষাপটে অবস্থাদৃষ্টে এই 'সাধারণত' শব্দটাকে আমাদের কাছে সমস্যাজনক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। কেননা পরিসংখ্যানগত দিক দিয়ে হলেও আমাদের গবেষণা-মাঠকর্মে এ রোগে আক্রান্ত পুরুষের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য ছিল না। এটি আমাদের সামনে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে, আর তা হলো— যদি সে সময় এ পুরুষগুলো ওই পুরো ঘটনার অংশ না হয়ে অন্য কোনো সময়ে একই ধরনের লক্ষণ নিয়ে চিকিৎসকদের কাছে যেতেন, তবে তাদেরকে হিস্টেরিয়ার রোগী হিসেবে চিহ্নিত করা হতো কি না? কেননা, সাধারণত নারীরাই বেশি আক্রান্ত হয় বলে যেসব কারণকে সামনে আনা হয়, সেগুলো যখন ভীষণরকমের লিঙ্গীয় সুরে কথা বলে (দ্বিতীয় অংশের আলোচনায় বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে), তখন এমনটাই প্রতীয়মান হয় যে, সমস্ত চাপ নেবার মতো সহ্যক্ষমতা কেবল পুরুষেরই আছে, নারীর নেই। এমন প্রবণতার মাধ্যমে প্রকারান্তরে রোগ/অসুস্থতাটিকে পরোক্ষভাবে নারীকরণ করে ফেলা হয়, যার মধ্য দিয়ে এ রোগ/অসুস্থতাসংক্রান্ত আলোচনার পরিসর থেকে পুরুষ ধীরে ধীরে দৃশ্যের অন্তরালে চলে যায়, যা কিনা আবার রোগ/অসুস্থতাজনিত কারণে সৃষ্ট বাস্তবতায় নির্দিষ্ট লিঙ্গীয় পরিচয়কে ঘিরে বৃহত্তর লিঙ্গীয় রাজনীতিকেই প্রতিফলিত করে।

হিস্টেরিয়া নামক রোগ/অসুস্থতার সাথে পুরুষকে জুড়ে দেখবার এই অনীহার অনেক বড়ো কারণ হিসেবে কাজ করে এর ঐতিহাসিক লিঙ্গীয় নির্মাণ, যেখানে নারী আর হিস্টেরিয়াকে সমার্থক করে ফেলা হয়। এরকম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই নিবন্ধের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে কীভাবে একটি রোগ/অসুস্থতা হিসেবে হিস্টেরিয়া, গণহিস্টেরিয়া ভীষণরকমের লিঙ্গীয় তথা নারীসুলভ হয়ে ওঠে তাকে ঐতিহাসিকভাবে প্রেক্ষিতকরণপূর্বক (ঐতিহাসিক অতীতে এবং বর্তমানে) উপস্থাপন এবং বিশ্লেষণ করবার মাধ্যমে রোগ/অসুস্থতা ও শরীরের লিঙ্গীয় স্বরূপকে খতিয়ে দেখা।

হিস্টেরিয়া, গণহিস্টেরিয়ায় 'নারী' : লিঙ্গীয় দৃশ্যমানতার ঐতিহাসিক পটভূমি

অধুনা অনেক চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞদের তরফ থেকে মাস-হিস্টেরিয়া বা গণহিস্টেরিয়াকে মাস-সাইকোজেনিক ইলনেস বা গণমনস্তাত্ত্বিক অসুস্থতা বলে উল্লেখ করবার কথা প্রস্তাব করা হলেও এই রোগ/অসুস্থতা বিশ্বব্যাপী কয়েকশত বছর ধরে মাস-হিস্টেরিয়া বা গণহিস্টেরিয়া নামেই চলে এসেছে এবং এখনো অনেকেই এই রোগ/অসুস্থতাকে মাস-হিস্টেরিয়া বা গণহিস্টেরিয়া হিসেবেই উল্লেখ করে থাকেন। অন্যদিকে, এই রোগ/অসুস্থতায় নারীদের অধিক হারে আক্রান্ত হবার বিষয়টি বরাবরই জোরেশোরে পরিবেশিত হয়েছে/হয় (আমাদের গবেষণা-মাঠ আদিয়াবাদের ক্ষেত্রেও একই বাস্তবতা পরিলক্ষিত হতে দেখি)। ফলে, মাস-হিস্টেরিয়া বা গণহিস্টেরিয়াকে মাস-সাইকোজেনিক ইলনেস অথবা মাস-সোশিওজেনিক ইলনেস, ইত্যাদি যা কিছুই নামকরণ করা হোক না কেন, তার প্রেক্ষাপট আর কেনইবা এই রোগ/অসুস্থতাকে নারীদের সাথে জুড়ে দেখা হয়/দেখবার প্রবণতা বিদ্যমান তা হিস্টেরিয়া, গণহিস্টেরিয়াসংক্রান্ত ঐতিহাসিক আলোচনা ছাড়া বোঝা সম্ভব নয়।

গণহিস্টেরিয়াসংক্রান্ত ধারণাটিকে Rousseau (1993) ঊনবিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার বলে আখ্যায়িত করলেও American Family Physician নামক একটি জার্নালে প্রকাশিত লেখা থেকে দেখা যায় যে, মূলত ৬০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে নানা সংস্কৃতি ও নানা স্থানে এই প্রকারের রোগ/অসুস্থতার নমুনা খুঁজে পাওয়া যায়

[২] আমাদের মাঠ-গবেষণার তথ্য সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল আক্রান্ত শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক এবং পরিবারের লোকজনদের নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ; অ-আক্রান্ত শিক্ষার্থী, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে নানা সময়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং আক্রান্ত ও অ-আক্রান্ত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে (বয়ঃসন্ধির) আলাদা-আলাদাভাবে দলগত আলোচনা। এছাড়াও স্থানীয় চিকিৎসক হিসেবে মসজিদের হুজুর, হোমিওপ্যাথির চিকিৎসক, স্থানীয় পর্যায়ের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গসহ নানাস্তরের মানুষজনের সঙ্গেও আমরা আলাপ করি।

(Timothy 2000:2649)। আধুনিক জৈব চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে গণহিস্টেরিয়াকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়—

> Mass hysteria - other names include collective hysteria, mass psychogenic illness, or collective obsessional behavior is the sociological phenomenon of the manifestation of the same or similar hysterical symptoms by more than one person. A common manifestation of mass hysteria occurs when a group of people believe they are suffering from a similar disease or ailment (Wikipedia on Mass hysteria)

এই সংজ্ঞানুযায়ী, মাস-হিস্টেরিয়া, যাকে কালেক্টিভ/সামষ্টিক হিস্টেরিয়া, মাস-সাইকোজেনিক ইলনেস/গণমনস্তাত্ত্বিক অসুস্থতা অথবা কালেক্টিভ অবসেশনাল বিহেভিয়ার/সামষ্টিক আবেশগত আচরণ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে একই ঐতিহাসিক লক্ষণে একাধিক ব্যক্তির আক্রান্ত হবার সমাজতাত্ত্বিক প্রপঞ্চের ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি। মাস-হিস্টেরিয়ার একটা সাধারণ অভিব্যক্তি তখনই ঘটে, যখন একদল লোক বিশ্বাস করে যে, তারা একই ধরনের রোগ বা অসুস্থতায় ভুগছে।

আজ পর্যন্ত বিশ্বে বৃহৎ সংখ্যায় এ ধরনের যত অসুস্থতার ঘটনা ঘটেছে, তাতে একসাথে অনেকের প্রায় একই ধরনের লক্ষণে আক্রান্ত হওয়া, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অধিক হারে নারীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া, অল্পসময়ে সেরে ওঠা; এ ধরনের যাবতীয় অসুস্থতাকে যখন চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রচলিত শনাক্তকরণ পদ্ধতিতে চিকিৎসকদের পক্ষে শনাক্ত করা সম্ভব হয় নি, তখন অসুস্থতায় আক্রান্ত জনসাধারণ ব্যতীত অপরাপর জনসাধারণের কাছে এরকম অসুস্থতার ব্যাখ্যায়, নামকরণে চিকিৎসকরা গণহিস্টেরিয়া নামটি দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যবহার করে আসছেন। অধুনা গণহিস্টেরিয়াকে মাস-সোশিও/সাইকোজেনিক ইলনেসও বলা হয় (Bartholomew & Goode 2000, Bartholomew & Wessely 2002, Wikipedia)। Harfer (1985) বলেন যে, ১৯৮৫ সাল নাগাদ এ ধরনের ১৮০টি অসুস্থতার খবর পাওয়া যায়। ৩০টিরও বেশি টার্ম এর উল্লেখ এ ধরনের প্রাদুর্ভাবের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যার মধ্যে বহুলশ্রুত কিছু টার্ম হচ্ছে mass hysteria, mass psychogenic illness, hysterical contagion, epidemic hysteria প্রভৃতি (Harfer in Verma & Srivastava 2003)। গণহিস্টেরিয়ার লক্ষণগুলোর মধ্যে আছে মাথাব্যথা, অজ্ঞান বা ফিট হওয়া, তীব্র মাথাব্যথা, খিঁচুনি, বুকে ব্যথা, দমবন্ধ ভাব, বমিবমি ভাব বা বমি, চোখে ঝাপসা দেখা, প্রলাপ বকা প্রভৃতি (ICDDR,B 2008), যেগুলো সম্পর্কে আমাদের গবেষণা-মাঠকর্মে অসুস্থতায় আক্রান্তদের কাছ থেকেও শুনতে পাই। একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা এসব লক্ষণের বহিঃপ্রকাশকে হিস্টেরিয়া বলে অভিহিত করেন। গণহিস্টেরিয়া নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে হিস্টেরিয়া সম্পর্কে আলোচনা তাই নিতান্তই প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

ভিক্টোরিয়ান আমলে চিকিৎসাশাস্ত্রে হিস্টেরিয়া নিয়ে ব্যাপক আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিম ইউরোপে কয়েকশত বছর ধরে এর নিরূপণ এবং চিকিৎসাবিধান ছিল একটি নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। প্রাচীনকাল থেকেই হিস্টেরিয়া রোগটির প্রাদুর্ভাবকে শনাক্ত করা যায়। গ্রিসে হিপোক্র্যাটিক কর্পাসের ‘গাইনোকোলজিক্যাল ট্রিটিজ’-এ এই রোগের বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায়, যার সময় ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৫ম এবং ৪র্থ শতাব্দী। এমনকি এরও আগে মিশরীয় প্যাপিরাসের ওপর লিখিত হস্তলিপিতেও এ রোগ সম্পর্কে বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায়। ‘প্লেটোর সংলাপ’-এ টিমেয়াসকে বলতে শোনা যায় যে, একটা জরায়ু একজন নারীর সমগ্র শরীর জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, পরে এটি ফুসফুসে ঢুকে পড়বার কারণে সেই নারী শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এই তত্ত্বটিই এই রোগের নামকরণের উৎস। হিস্টেরিয়া নামক রোগটির উৎপত্তি গ্রিকশব্দ Hystera থেকে, যার সমার্থক হলো জরায়ু।

১৮৫৯ সালে একজন চিকিৎসক দাবি করেন যে, সিকিভাগ নারী হিস্টেরিয়াতে ভোগেন। এরকম দাবি করাটা সংগত হয়ে ওঠে এ কারণে যে, একজন চিকিৎসক হিস্টেরিয়ার সম্ভাব্য লক্ষণ হিসেবে ৭৫ পৃষ্ঠার লক্ষণনামা তৈরি করেন এবং তারপরও এই তালিকাকে অসম্পূর্ণ বলে অভিহিত করেন। প্রায় সব ধরনের সামান্য অসুস্থতাই এই ডায়াগনোসিসের সাথে খাপ খেয়ে যায়। হিস্টেরিয়া রোগটির সাথে এতগুলো লক্ষণকে জুড়ে দেয়া আছে যে, সেখানে আদতে সব ধরনের অশনাক্তকৃত অসুস্থতাকেই এঁটে দেয়া সম্ভব। চিকিৎসা বিষয়ক লেখালেখিগুলোতে নিযুক্ত অনেক লেখক দাবি

করেন যে, কনভার্সন ডিজঅর্ডার, যেমন হিস্টেরিয়া সম্পর্কে আগের তুলনায় মানুষজনের মধ্যে বোঝাপড়া তৈরি হয়েছে, তারা এ রোগের পিছনকার মনস্তত্ত্বকে বুঝবার জ্ঞান লাভ করেছেন আর সে কারণে এ রোগকে কেন্দ্র করে সমাজ থেকে আর সেরকম কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করে এটাও বলা হয় যে, রোগটি আছে বটে তবে তা প্রতিস্থাপিত হয়েছে চিকিৎসকের দ্বারা। অর্থাৎ, চিকিৎসক ছাড়া কেউ খালি চোখে রোগটির অস্তিত্ব খুঁজে পান না (Wapedia on female Hysteria)।

Elaine Showalterসহ অন্যান্যের সম্পাদিত (1993) 'Hysteria Beyond Freud' নামক গ্রন্থে হিস্টেরিয়াসংক্রান্ত বিষয়ে নানাসময়ে নানাজনের বিভিন্ন ধরনের আলোচনা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা হিস্টেরিয়ার লিঙ্গীয় রাজনীতি বুঝবার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। উক্ত গ্রন্থের একটি প্রবন্ধ 'A Strange Pathology: Hysteria in the Early Modern World, 1500-1800'-এ Rousseau উল্লেখ করেন যে, Leopois (1620)-এর পর Sydenham হলেন প্রথিতযশা চিকিৎসকদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি, যিনি হিস্টেরিয়া ব্যাখ্যায় 'Uterine etiology' (অর্থাৎ, নারীর জরায়ুর সাথে সম্পৃক্ত করে রোগের ব্যাখ্যা) থেকে বের হয়ে এসে রোগটিকে ব্যাখ্যা করেন। Sydenham তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেন যে, হিস্টেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর ব্যথা-বেদনা অন্য যেকোনো অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগীর চেয়ে দুঃসহ। তিনিই প্রথম বলেন যে, কোনো একক অঙ্গ এ রোগের জন্য দায়ী নয়। বরং, মানসিক আবেগ এবং শারীরিক বিকারের যৌথ সমন্বয়ে এ রোগের সূচনা ঘটে, যা ক্রিয়া করে স্নায়ুর মধ্য দিয়ে। এই শেষোক্ত বিষয়টিতে এসে তিনি দৃঢ়ভাবে Leopois থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন, যেখানে Leopois মস্তিষ্ককে হিস্টেরিয়ার উৎসকেন্দ্র বলে ভাবতেন। সংক্ষিপ্তভাবে বললে, Sydenham তিনটি র‍্যাডিকেল উপসংহারে উপনীত হন :

প্রথমত, নারী এবং পুরুষ উভয়েরই হিস্টেরিয়া হতে পারে। দ্বিতীয়ত, সব রোগের মধ্যে সর্বাধিক সাধারণ রোগ হলো হিস্টেরিয়া। তৃতীয়ত, হিস্টেরিয়া হলো সভ্যতার সক্রিয়রূপ; অর্থাৎ, যে সব লক্ষণ হিস্টেরিয়ার দিকে ধাবিত করে, সেগুলো সংস্কৃতিকে অনুকরণ করে উৎপত্তি লাভ করে। তাঁর মতে, হিস্টেরিয়া অন্য সব রোগের অনুকরণ করে। হিস্টেরিয়া একভাবে সভ্যতাকেও অনুকরণ করে। এই প্রক্রিয়ায় Sydenham রোগ হিসেবে হিস্টেরিয়াকে কেবল শরীর কিংবা কেবল মনের সাথে সম্পৃক্ত করে দেখবার মানসিকতা থেকে সরে এসে রোগের সাথে সমাজ সংস্কৃতিকে যুক্ত করে দেখবার প্রয়াস পান (Rousseau 1993:139-145)। আবার, Porter (1993:242)ও বলেন যে, দেহ এবং মন তাদের নিজেদের মধ্যে কোনো স্থবির ক্যাটাগরি নয়; বরং সংস্কৃতি, চিকিৎসাবিদ্যা এবং সমাজের পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ায় কীভাবে মানুষের দেহ ও মন পরিবেশিত হয় সেটিকে দেখা গুরুত্বপূর্ণ।

একই গ্রন্থের 'Hysteria, Feminism and Gender' নামক প্রবন্ধে Showalter হিস্টেরিয়ার ঐতিহাসিক লিঙ্গীয় নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করেন। হিস্টেরিয়া বিষয়ক আলোচনায় খুব উল্লেখযোগ্য একটি নাম হচ্ছে Charcot; যদিও তিনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে সচেতন ছিলেন যে, সাধারণত মানসিক এবং আবেগিক আঘাত থেকেই হিস্টেরিয়া বিকাশ লাভ করে। তথাপি তিনি হিস্টেরিয়াকে দেখেছেন শরীরের সাথে জুড়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে তিনি হিস্টেরিয়াকে বংশগত রোগ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। Charcot বিশ্বাস করতেন যে, নারী এবং পুরুষ উভয়েই হিস্টেরিয়ায় আক্রান্ত হতে পারেন। অর্থাৎ বিভিন্ন কারণে হিস্টেরিয়া হতে পারে, যা জেন্ডারের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু তারপরও মনস্তাত্ত্বিক বা সামাজিক কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে না গিয়ে তিনি হিস্টেরিয়াকে শারীরিক রোগ হিসেবে ব্যাখ্যা করবার প্রতি অধিক মনোযোগী ছিলেন। Charcot-এর পর হিস্টেরিয়াকে ব্যাখ্যা করবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন Freud, যিনি মনঃসমীক্ষণের জন্য বিখ্যাত। হিস্টেরিয়াকে মনঃসমীক্ষণের জন্মদাত্রী হিসেবে অভিহিত করে Eissler বলেন :

> …the discovery of psychoanalysis would have been greatly impeded, delayed, or even made impossible if in the second half of the nineteenth century the prevailing neurosis had not been hysteria." (Eissler in Showalter 1993:320)

Eissler প্রদত্ত মূল্যায়ন থেকে প্রকারান্তরে যে বিষয়টি উঠে আসে তা হলো, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ব্যাপক বিস্তৃত নিউরোসিস/স্নায়ুরোগটি যদি হিস্টেরিয়া না হতো, তবে মনঃসমীক্ষণের আবিষ্কার অনেক বিঘ্নিত, বিলম্বিত অথবা না হওয়াটাও সম্ভবপর ছিল।

হিস্টেরিয়াকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Freud বলেন যে, বিরক্তিকর/বাধাপড়া কোনো যৌন অভিজ্ঞতা যা হয়তবা ভুলে যাওয়া হয়েছে কিংবা দাবিয়ে রাখা হয়েছে, সেখান থেকে যে আঘাত তৈরি হয় সেটাই পরবর্তী সময়ে হিস্টেরিয়ার দিকে ধাবিত করে। পরবর্তী সময়ে নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা এ ধরনের ব্যাখ্যার সমালোচনা করেন। কেননা হিস্টেরিয়ার এ ধরনের ব্যাখ্যায় যৌনতার সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলি যত গুরুত্ব পায়, অন্যান্য সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক ফ্যাক্টরগুলো এই অতি গুরুত্বারোপের কারণে দৃশ্যপট থেকে আড়ালে সরে যায়। অধুনা এটা স্বীকৃত বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে যে, হিস্টেরিয়ায় আক্রান্ত হবার প্রবণতা নারীদের বেশি থাকলেও পুরুষেরাও হিস্টেরিয়ায় আক্রান্ত হতে পারেন, যদিও চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, এই আবিষ্কার কয়েক শতাব্দী আগেকার। কালভেদে, প্রেক্ষাপটভেদে, জেন্ডারভেদে হিস্টেরিয়া নামক রোগ/অসুস্থতার নামকরণের ভিন্নতাকে শনাক্ত করেন Showalter (1993:293) এবং তিনি একে অভিহিত করেছেন 'জেন্ডারড বিপরীতার্থক দ্বিবিভাজন' হিসেবে, যা নারী ও পুরুষভেদে নিম্নলিখিত—

- রেনেসাঁকালে : হিস্টেরিয়া/মেলানকলি
- সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে : হিস্টেরিয়া/হাইপোকন্ড্রিয়া
- ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে : হিস্টেরিয়া/নিউরেস্থিনিয়া
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে : হিস্টেরিয়া/শেল শক সিন্ড্রোম
- ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণের পরিসরে : হিস্টেরিয়া/অবসেশনাল নিউরোসিস

উল্লিখিত তথ্যে লক্ষণীয় বিষয় হলো, পরিবর্তন যে প্রত্যয়েই হোক না কেন, পুরুষের ক্ষেত্রে প্রত্যয়ের পরিবর্তনে যতটা সচেতন প্রচেষ্টা উপস্থিত, নারীর ক্ষেত্রে ততটাই অনুপস্থিত। এমনটি কেন? এক্ষেত্রে প্রথমত দেখা দরকার হয়ে পড়ে যে, কীভাবে শুরু থেকে পুরুষের ক্ষেত্রে হিস্টেরিয়াকে বিবেচনা করা হয়েছে। শুরুর দিককার এ বিষয়ক অনেক লেখালেখিতে, অধ্যয়নে দেখা গেছে, হিস্টেরিয়াগ্রস্ত পুরুষকে অ-পুরুষসুলভ, মেয়েলি ভাবাপন্ন অথবা সমলিঙ্গীয় যৌনতা চর্চাকারী বলে মনে করা হতো। অবস্থাদৃষ্টে এমনটাই মনে হয় যে, পুরুষত্বের পরিসরে নারীবাচক যেকোনো উপাদানই যেন খোদ রোগের একটি লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায় (Showalter 1993:289)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'A System of Medicine' গ্রন্থে হিস্টেরিয়ায় আক্রান্ত পুরুষকে মানসিকতা অথবা নৈতিকতার দিক থেকে মেয়েলি গঠনের বলে অভিহিত করে John Russel Reynolds লিখেন—

> either mentally or morally of feminine constitution (Reynolds in Showalter 1993:289)

যেকোনো কারণেই হোক, পুরুষের হিস্টেরিয়া নিয়ে Charcot-এর কাজ মেডিকেল ডিসকোর্সে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রাখতে সমর্থ হয় নি। ইতিহাস কেনইবা অগাস্টিনকে (Charcot-এর চিকিৎসাধীন সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হিস্টেরিয়াগ্রস্ত নারী) মনে রেখেছে আর Charcot বর্ণিত অপরাপর হিস্টেরিয়াগ্রস্ত পুরুষদেরকে বিস্মৃত হয়েছে, তা ভেবে দেখবার বিষয়। ব্রিটিশ চিকিৎসক সমাজে পুরুষের হিস্টেরিয়ার ধারণা সবসময় প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে হয় কোনো প্রত্যয়ীকরণের ছদ্মাবরণে জৈবিক বিশ্লেষণের দ্বারা, নতুবা অস্বীকার এবং ছুড়ে ফেলার নানা ধরনের মধ্য দিয়ে (Showalter 1993:313)। পরিহাসের বিষয় হলো, Charcot-এর মৃত্যুর পর তার সব থেকে নামকরা শিক্ষার্থী Sigmund Freudও পুরুষের হিস্টেরিয়াকে দৃশ্যপটের আড়ালে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে অনেক বড়ো ভূমিকা রাখেন। পুরুষের হিস্টেরিয়ার অস্তিত্বকে যদিও তিনি ক্রমাগত স্বীকার করে যেতে থাকেন, তথাপি ভিয়েনাতে হিস্টেরিয়ার ওপর Freud-এর গবেষণামূলক কাজ নারীদেরকে ঘিরেই আবর্তিত হতে থাকে (Showalter 1993:314, 315)।

পুরুষের হিস্টেরিয়াকে দৃশ্যপটের আড়ালে নিয়ে যাওয়ার একই ধরনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় Dr. Charles S. Myers-এর ক্ষেত্রেও। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ফ্রান্সে ব্রিটিশ সৈন্যদের মধ্যে তিনি সাময়িক বিস্মৃতি, দুর্বল দৃষ্টিশক্তি

এবং আবেগিক হতাশাগ্রস্তের মতো লক্ষণসমূহ দেখতে পান, যেগুলোকে তিনি হিস্টেরিয়ার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করলেও পূর্বাপর চিকিৎসকদের মতোই তিনিও এক্ষেত্রে হিস্টেরিয়া নামটি ব্যবহার করতে চান নি, যেহেতু রণক্ষেত্রে যুদ্ধরত পুরুষদের ওপর এ রোগের তকমা লেগে যাওয়াটা প্রকারান্তরে কাপুরুষত্বের লক্ষণ। কেননা প্রবল মেডিকেল ডিসকোর্স অনুযায়ী, এ রোগ/অসুস্থতাটি নামকরণের দিক থেকে নারীদেহের সাথে যুক্ত। অন্যদিকে, হিস্টেরিয়াগ্রস্ত পুরুষদের নিয়েও প্রচলিত ছিল নানা ধরনের নির্মাণ, যা আমরা একটু আগেই জেনেছি। এর ফলে চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোকে রোগটির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে Myers বলেন যে, বিস্ফোরিত শেলের কাছাকাছি থাকায় সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে আঘাত লাগবার কারণে সৈনিকদের মধ্যে এরূপ লক্ষণসমূহ দেখা দিয়েছে। তিনি রোগটির নাম দেন 'শেল শক সিন্ড্রোম', যদিও পরবর্তী সময়ে Myers বিস্ফোরিত শেল এবং স্নায়বিক লক্ষণগুলোর মধ্যে কোনো জৈবিক সম্পর্ক দেখাতে পারেন নি (Showalter 1993:321)। অন্যদিকে, ফরাসি চিকিৎসকেরা হিস্টেরিয়া নামটি ব্যবহার করতে চান নি, যেহেতু Charcot-এর সুনামের সাথে তাদের এক ধরনের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব ছিল। তৎকালীন সেনা-কর্তৃপক্ষ এ ধরনের অসুস্থতাকে কাপুরুষতার লক্ষণ হিসেবে দেখেন এবং কয়েকজন সিনিয়র অফিসার এ রোগে আক্রান্তদের কোর্ট মার্শাল করে গুলি করে মারার কথা চিন্তা করেন (Showalter 1993:321-322)।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই নারীদের হিস্টেরিয়াগ্রস্ততাকে যেভাবে অর্থ দেয়া হয়েছে, তা নারী শরীরকে ঘিরে নেতিবাচক অর্থবাচকতা তৈরি করে, যেখানে নারী চিত্রিত হয় নার্ভাস সত্তা হিসেবে আর এভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়ায় হিস্টেরিয়াগ্রস্ত নারী সামাজিকভাবে অযথার্থ বলে প্রতিপন্ন হয়। একইসাথে হিস্টেরিয়াগ্রস্ত নারীর শরীর চিকিৎসাবিজ্ঞানের জন্য যথার্থ ক্ষেত্র হয়ে ওঠে (Foucault in Petersen and Bunton 1997:160)।

অন্যদিকে, নারীবাদীদের কাজে হিস্টেরিয়া/গণহিস্টেরিয়াকে দেখা হয়েছে ভিন্ন মাত্রায়, ভিন্ন আঙ্গিকে। যেমন, Bordo (1989:13, 16) তাঁর কাজে হিস্টেরিয়াকে সংস্কৃতির ট্যাক্সট হিসেবে পাঠ করবার ওপর জোর দেন। কেননা তাঁর মতে, হিস্টেরিয়াকে যেভাবে নারীর অসুস্থতা বলে বয়ান করা হয়, তার মধ্য দিয়ে সমাজ-সংস্কৃতির লিঙ্গীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। এক্ষেত্রে নারী সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক বিবৃতি একভাবে উঠে আসে, যা প্রকারান্তরে সমাজের জেন্ডার বিবৃতিকে পাঠ করবার রাস্তা দেখায়। Bordo তাঁর বিশ্লেষণে Foucault ও Bourdieur ধারণাকে সরাসরি ব্যবহার করে বলেন যে, শরীরকে সংস্কৃতির একটা রূপক হিসেবে পাঠ করা যায়। আর এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শরীরকে বিশ্লেষণ করবার প্রক্রিয়ায় এই বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, শরীর কেবল সংস্কৃতির একটা ট্যাক্সটই নয়, বরং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটা প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক ক্ষেত্রও বটে।

গণহিস্টেরিয়ার প্রেক্ষাপটে নারীর লিঙ্গীয় নির্মাণের স্বরূপ : প্রেক্ষাপট আদিয়াবাদ

আলোচনার এ পর্যায়ে একটি নির্দিষ্ট রোগ/অসুস্থতায় (গণহিস্টেরিয়ায়) অন্তর্নিহিতভাবে বিদ্যমান লিঙ্গীয় রাজনীতি ও তার চর্চাকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নরসিংদীর আদিয়াবাদে আমাদের একটি মাঠ-গবেষণার আলোকে উপস্থাপন করা হবে। একটি নির্দিষ্ট রোগ/অসুস্থতার কীভাবে লিঙ্গীয়করণ ঘটে তা প্রেক্ষিতকরণপূর্বক আলোচনার মাধ্যমে রোগ/অসুস্থতা এবং শরীরকে ঘিরে লিঙ্গীয় মতাদর্শিক নির্মাণের উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়াটিকে স্পষ্ট করার চেষ্টাও করা হবে।

২০০৭ সালের জুলাই থেকে আগস্ট মাস অব্দি বাংলাদেশের ১৬টি জেলার ২০টি স্কুলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের আকস্মিক অসুস্থতার প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়, যা গণহিস্টেরিয়া বা মাস-হিস্টেরিয়া শিরোনামে পত্রপত্রিকা এবং ইলেকট্রনিক প্রচারমাধ্যমগুলোর কল্যাণে আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়। এ রোগ/অসুস্থতায় আক্রান্তদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী ছিল বলে পরিবেশিত হয়। উল্লেখ্য যে, নরসিংদীর রায়পুরা থানার অন্তর্গত আদিয়াবাদ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ক্ষেত্রে এ ধরনের আকস্মিক অসুস্থতার ঘটনাটি সর্বাধিক প্রচারণা পায়। ১৪ জুলাই, ২০০৭ তারিখে এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপকহারে আকস্মিক অসুস্থতার সংক্রমণ ঘটলে তা দেশব্যাপী আলোচনার

সৃষ্টি করে, যদিও বাংলাদেশে এর আগে কখনো যে এমন অসুস্থতার ঘটনা ঘটে নি বিষয়টি তেমন নয়। বরং বিচ্ছিন্নভাবে হলেও বিভিন্ন সময়ে নানা পত্রপত্রিকায় এমন ঘটনার খবর স্বল্প পরিসরে হলেও লক্ষ করা গেছে।[৩]

তাছাড়া, আন্তর্জাতিকভাবেও বিগত দুই দশকের বিভিন্ন সময়ে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ভারত, নেপাল, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকা, কুয়েত, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে এই রোগ/অসুস্থতার প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা গেছে (Bartholomew & Goode 2000, Bartholomew & Wessely 2002, Bartholomew 2005, Verma & Srivastava 2003)। বিভিন্ন দেশে এ ধরনের রোগ/অসুস্থতায় সংখ্যার দিক থেকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীরা আক্রান্ত হলেও নাইজেরিয়াতে, ভারতের দিল্লিতে (যেখানে এ ধরনের রোগ/অসুস্থতার ঘটনা 'Monkey Man' নামে পরিচিতি লাভ করে) পুরুষদের আক্রান্ত হবার হার বেশি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক কাল থেকে এ ধরনের রোগ/অসুস্থতার সাথে নারীকে জুড়ে দেখবার প্রবণতা বিদ্যমান, যেহেতু এ ধরনের রোগ/অসুস্থতার নামকরণের সাথে নারীদেহের যুক্ততা রয়েছে, যার স্বরূপ ইতোমধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

বাস্তবতায় গণহিস্টেরিয়ার নানা ঘটনা পর্যালোচনা করে আমরা দেখেছি যে, নারীরাই বেশি আক্রান্ত হলেও পুরুষরা যে এতে আক্রান্ত হন না বিষয়টি মোটেও তা নয়। নরসিংদীর আদিয়াবাদে মাঠ-গবেষণার প্রেক্ষিতে আমরা দেখেছি যে, আক্রান্ত ৫২ জনের মধ্যে ১০ জনই ছিল পুরুষ। আপাতভাবে এটা মনে হতে পারে যে, আদিয়াবাদ এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদাহরণ। কিন্তু গণহিস্টেরিয়ার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়া অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কয়েকটির মধ্যে পরিচালিত কিছু প্রাতিষ্ঠানিক অনুসন্ধানে আক্রান্তদের মোট সংখ্যা এবং আক্রান্ত নারী-পুরুষের আনুপাতিক হার উঠে এলেও সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ বিষয়ে কোনো নিবিড় গবেষণাকাজ না হবার কারণে গণহিস্টেরিয়ায় আক্রান্ত নারী-পুরুষের আনুপাতিক হার নিয়ে বিস্তারিত আর কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।[৪]

প্রচলিত পরিবেশন-বাস্তবতায় রোগ/অসুস্থতার ঘটনা পরিবেশনে আক্রান্তদের সংখ্যা নিরূপণের বিষয়টিকে মুখ্য বলে গণ্য করা হয় (যা কিনা অপরাপর দুর্ঘটনা/দৈব দুর্বিপাকের ঘটনা পরিবেশনের বেলায়ও সমভাবে প্রযোজ্য), তখন তা দুই ধরনের সংকট তৈরি করে। প্রথমত, এ রোগ/অসুস্থতার ঘটনা পরিবেশনে আক্রান্তদের সংখ্যা প্রাথমিকভাবে গুরুত্ব পাবার কারণে যারা বেশি সংখ্যায় আক্রান্ত হয়েছে, তাদের সংখ্যাটাই বারবার উল্লেখ করা হয়। আর এক্ষেত্রে যেহেতু আক্রান্তদের একটা বৃহদাংশ ছিল নারী, সেহেতু অসুস্থতার কারণ ব্যাখ্যায় তখন অনিবার্যভাবে লিঙ্গীয় চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন ঘটে এবং তখন থেকেই দ্বিতীয় ধরনের সংকট তৈরি হয়। অর্থাৎ বেশিরভাগ নারীদের অসুস্থতার কারণগুলো তুলে ধরতে গিয়ে যেসব বিষয়কে সামনে নিয়ে আসা হয় (যেমন মেয়েদের মানসিক সহ্যক্ষমতা কম, তাদের প্রকাশক্ষমতা কম, মেয়েরা চাপ নিতে পারে না, তারা কোমলমতি, মেয়েদের মন দুর্বল প্রভৃতি), সেগুলো আবার পুরুষের সামাজিক নির্মাণের সাথে খাপ খায় না। এভাবে রোগ/অসুস্থতাটিই যখন খোদ নারীসুলভ হয়ে ওঠে, তখন সেখানে পুরুষকে দেখবার অবকাশ আর থাকে না। রোগ/অসুস্থতার পুরো ঘটনাপ্রবাহ থেকে তখন আক্রান্তপুরুষ ধীরে ধীরে আলোচনার বাইরে পর্যবসিত হয়।

---

[৩] বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নরসিংদীতে ২০০৭ সালে আদিয়াবাদের ঘটনাটির আগেও বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের ঘটনার নজির পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ ২০০৫ সালে মেহেরপুরে, ২০০৬ সালে মুন্সীগঞ্জের টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় এ ধরনের অসুস্থতার ঘটনা ঘটেছিল। সেসময় এগুলো বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এসেছিল মূলত অজ্ঞাত রোগ হিসেবে। খোদ ২০০৭ সালের এপ্রিল মাসেই এরকম একটি অসুস্থতার ঘটনা ফরিদপুরে ঘটে, যেটি সম্পর্কে রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণাকেন্দ্র (IEDCR) অবহিত হয় ১৩ এপ্রিল। IEDCR-এর অপ্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, এই অসুস্থতার খবর স্থানীয় ও জাতীয় পত্রপত্রিকা এবং অন্যান্য প্রচারমাধ্যমে প্রচারিত হয়। কিন্তু ২০০৭ সালের জুলাই মাসে অসুস্থতার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আদিয়াবাদ যতটা ব্যাপক আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে (বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে, সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে), সেরকমটি এর আগে কখনো হয় নি।

[৪] ২০০৭ সালে দেশব্যাপী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে গণহিস্টেরিয়ার ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটলে রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণাকেন্দ্র (IEDCR) এবং ICDDR,B যৌথভাবে ২০০৭ সালের ৪ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত নরসিংদী, নাটোর, ঢাকা এবং নোয়াখালী জেলার ৪টি বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত সর্বমোট ২,৫৫১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি জরিপ কাজ সম্পন্ন করে, যার মধ্যে গণহিস্টেরিয়ায় আক্রান্তদের মোট সংখ্যা ছিল ৩৭০ জন এবং আক্রান্তদের মধ্যে শতকরা ৮৪ ভাগ (৩০৯/৩৭০) ছিল নারী।

আরো স্পষ্ট করে বললে, কেনইবা নারীরা বেশি আক্রান্ত হন এমন প্রশ্নের উত্তরে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চিকিৎসক/বিশেষজ্ঞরা এ রোগ/অসুস্থতার সামাজিক কারণ (প্রধানত যেগুলো ঘুরেফিরে বারবার উল্লেখ করেছেন, যেমন অপুষ্টিতে ভোগে, বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনের চাপে ভোগে, পড়াশোনার চাপে ভোগে প্রভৃতি) হিসেবে সমাজে বিদ্যমান লিঙ্গীয় অসমতার কথা উল্লেখ করলেও একইসঙ্গে যখন এ রোগ/অসুস্থতার সাথে নারী সম্পর্কে প্রচলিত সাংস্কৃতিক ডিসকোর্সসমূহকে (যেমন মেয়েদের মানসিক সহ্যক্ষমতা কম, তাদের প্রকাশক্ষমতা কম, মেয়েরা চাপ নিতে পারে না, তারা কোমলমতি, মেয়েদের মন দুর্বল প্রভৃতি) জুড়ে দিয়ে এ রোগ/অসুস্থতায় নারীদের অধিক হারে আক্রান্ত হবার বিষয়টিকে ধারণায়ন করেন, তখন আদতে এই রোগ/অসুস্থতাকে একটা লিঙ্গীয় চেহারা প্রদান করা হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, চিকিৎসক/বিশেষজ্ঞরা ছাড়াও সমাজের অপরাপর মানুষজনও যখন এই একই মনোভাবের প্রতিফলন ঘটান (যা আমরা আদিয়াবাদের মাঠ-গবেষণায় লক্ষ করি), তখন প্রকারান্তরে সমাজে নারী সম্পর্কে প্রচলিত আধিপত্যশীল লিঙ্গীয় মতাদর্শকেই উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করা হয়।

এক্ষেত্রে খুব স্পষ্ট করেই বলা প্রয়োজন যে, এখানে আমরা কোনোমতে এমনটা বোঝাতে চাইছি না যে, সমাজে লিঙ্গীয় অসমতা/বৈষম্য নেই। আবশ্যিকভাবেই ঘরে-বাইরে তা বিদ্যমান— নানা চেহারায়, নানা মাত্রায়। চিকিৎসকদের দ্বারা চিহ্নিত সামাজিক কারণগুলোর সাথে নারীদের অধিক হারে আক্রান্ত হবার বিষয়টিকে যুক্ত করে দেখার কোনো কার্যকর ব্যাখ্যা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষরূপে উপস্থাপন করবেন আমরা তেমনটা আশা করছি না। তবে খোদ চিকিৎসকদেরই ভাষ্যমতে সামাজিক কারণের ফলে উদ্ভূত একটি রোগ/অসুস্থতায় তুলনামূলকভাবে নারীর অনেক বেশি আক্রান্ত হওয়াকে যখন নারীর সাপেক্ষে প্রচলিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক নির্মাণগুলোকেই আক্রান্ত হবার অন্তর্নিহিত কারণ হিসেবে সামনে আনা হয়, তখন এই রোগ/অসুস্থতায় নারীর অধিক হারে আক্রান্ত হবার বিষয়টিকে প্রাকৃতিকীকরণ করা হয়। আর এর মাধ্যমে এমন একটা পরোক্ষ বয়ান প্রতিধ্বনিত হয়, যেন পুরুষরাই সব ধরনের চাপ নিতে সক্ষম এবং সকল পুরুষের জন্যই সমাজ একটা সমগোত্রীয় বাস্তবতা। আবশ্যিক মাত্রাগত ভিন্নতাসহ সামাজিক অনুশাসনের নজরদারি নারীর পাশাপাশি পুরুষের ওপরেও বিরাজমান, যাকে চাইলেই তারা পুরোপুরি ভেঙে ফেলতে পারেন না। এর সাথে তাদের অন্তর্গত কামন-বাসনার টানাপোড়েন কাজ করে। এই সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটে অসুস্থতাকালে আক্রান্ত নারী-পুরুষের প্রলাপে।[৫]

অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়েছিলেন এমন পুরুষ যখন তার আক্রান্ত হবার কারণকে ব্যাখ্যা করেন, তখন তার নিজের আর অন্য পুরুষদের আক্রান্ত হবার কারণকে একইভাবে ব্যাখ্যা করেন না। একজন পুরুষ নিজের অসুস্থ হয়ে পড়াকে সেবাদানের মতো কাজের সাথে যুক্ত থাকার একটা আকস্মিক ফলাফল হিসেবে অভিহিত করে থাকেন, অথচ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এমন অন্য পুরুষদের মেয়েলি স্বভাবের আখ্যা দিয়ে সেটিকেই তাদের অসুস্থতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। নিজেকে ওই একই শ্রেণিভুক্ত করে দেখতে তারা রাজি হন না।

> ...হ্যাঁ, আমি দুইদিন অন্যদের সেবা করছি। পরে আমাদের ম্যাডাম পড়ার পরে আমি পড়ছি... তবে যে ছেলেগুলো পড়ছে তাদের খেয়াল করলে দেখা যায় তারা খেলাধুলা কম করে, ঘরের মধ্যেই থাকে, বেশি খেলে না, মানে প্রায় মেয়েদের মতোই ছোট্ট জায়গায় আবদ্ধ থাকে। এই ছেলেগুলো এরকম মন খুলে কথা বলে না, সবার সাথে মেশে না আর এতে তাদের এই অসুখ হলে এবিলিটি কম থাকে সেটা রোধ করার। তারাই দেখা যায় এই রোগে পড়ছে...(অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়েছিলেন এমন একজন পুরুষ তথ্যদাতার বয়ান)

হিস্টেরিয়া নামক রোগ/অসুস্থতার সাথে পুরুষকে জুড়ে দেখবার অনীহার অনেক বড়ো কারণ হিসেবে কাজ করেছে এর ঐতিহাসিক লিঙ্গীয় নির্মাণ, যেখানে নারী আর হিস্টেরিয়াকে সমার্থক করে ফেলা হয়। এ বিষয়টি পূর্বোক্ত আলোচনায় তুলে ধরা হলেও আরো প্রামাণ্যরূপে বুঝতে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে Auguste Fabre (1883) নামক একজন ফরাসি চিকিৎসক এর প্রদত্ত ভাষ্যে :

[৫] এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন, 'গণহিস্টেরিয়ার বহুমাত্রিকতা : গ্রামীণ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অসুস্থতার লিঙ্গীয় স্বরূপের উপাখ্যান, নৃবিজ্ঞান পত্রিকা (২০০৯), সংখ্যা : ১৪

> …all women are hysterical and… every woman carries with her the seeds of hysteria. Hysteria, before being an illness, is a temperament, and what constitutes the temperament of a woman is rudimentary hysteria. (Fabre in Showalter 1993:286-287)

উপর্যুক্ত ভাষ্যে তাঁর অভিমত অনুযায়ী যে বিষয়টি ব্যক্ত হয় তা হলো, সব নারীই হিস্টেরিয়াগ্রস্ত এবং সব নারীই তাদের সাথে হিস্টেরিয়ার বীজ বয়ে বেড়ায়। তাই তিনি অসুস্থতারও আগে হিস্টেরিয়াকে গণ্য করেছেন একটি মানসিক ও দৈহিক প্রকৃতি হিসেবে। আর যা কিনা নারীর প্রকৃতি/মেজাজ তৈরি করে তাকেই তিনি প্রাথমিক হিস্টেরিয়া বলে মন্তব্য করেন। অর্থাৎ হিস্টেরিয়াকে তিনি নারীর মানসিক ও দৈহিক প্রকৃতি/মেজাজের সমার্থক করে দেখেছেন। এ ধরনের বক্তব্য থেকে একটা বিষয় অন্তত খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আসলে এই রোগ/অসুস্থতার সাথে পুরুষকে অদৃশ্য করে দেবার প্রবণতা ঐতিহাসিক কাল থেকেই ভীষণরকমভাবে পিতৃতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা কর্তৃক প্রভাবিত। কেননা পুরুষের জন্য হিস্টেরিয়ায় আক্রান্ত হবার বিষয়টি কোনোভাবেই পুরুষালি আচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলেই মনে করা হয়, যেহেতু এ রোগ/অসুস্থতায় পুরুষের আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি প্রকারান্তরে পুরুষের লিঙ্গীয় পরিচয়ের মানহানি ঘটায়। এই পুরো বিষয়টিকে Israel বর্ণনা করেন এভাবে :

> The hysteria diagnosis become for a man… the real injury, assign of weaknesss, a castration in a word. To say to a man 'you are hysterical' became under these conditions a form of saying to him 'You are not a man.' (Israel in Showalter 1993 : 289)

Israel-এর প্রদত্ত বক্তব্য অনুসারে, একজন পুরুষের জন্য হিস্টেরিয়াসংক্রান্ত ডায়াগনোসিস পরিগণিত হয় বাস্তবিক আঘাত, দুর্বলতার চিহ্ন হিসেবে। এক কথায় বলতে গেলে যা পুরুষত্বহীনতারই শামিল। সে অনুসারে একজন পুরুষ মানুষকে এ ধরনের পরিস্থিতিতে 'আপনি তো হিস্টেরিয়াগ্রস্ত' এমনটা বলা প্রকারান্তরে বোঝায় যে 'আপনি তো পুরুষ নন।'

এরকম প্রবণতা স্থানীয় পর্যায়েও বিশেষভাবে লক্ষণীয়, যা একটু আগেই আমাদের মাঠকর্মে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে তুলে ধরা হয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় আধিপত্যশীল মতাদর্শ নারীকে যেভাবে দেখে, এমনকি আক্রান্ত একজন পুরুষ আক্রান্ত অপর পুরুষের অসুস্থ হবার কারণগুলোকে নারীর সামাজিক অবস্থানের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ বলে রোগ/অসুস্থতার লিঙ্গীয় ব্যাখ্যা যখন তার মতো করে দাঁড় করান, তখন তা থেকে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, এ রোগ/অসুস্থতাটাই অনেক বেশি মেয়েলি। যাতে পুরুষের আক্রান্ত হওয়াটাই একটা ব্যতিক্রমী বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়। এভাবে এই বিশেষ রোগ/অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে যখন নানা স্তর থেকে লিঙ্গীয় জ্ঞান বারবার সমাজে প্রচলিত লিঙ্গীয় জ্ঞানের সাথে যুক্ত হয়, তখন তা সেটিকে আরো ভিন্নমাত্রার জোরালো অর্থময়তা দেয়। তখন নারী সম্পর্কে প্রচলিত আধিপত্যশীল ডিসকোর্স আরো জোরদার হয়।

আবার একইসাথে এ ধরনের প্রবণতার মধ্যে বিদ্যমান থাকে ভিকটিমকেই গতানুগতিকভাবে স্টেরিওটাইপপূর্বক নিজেদের দুরবস্থার জন্য দোষারোপ করবার প্রবণতা (আহমেদ ও চৌধুরী ২০০৩ : ১২৩-১২৫)। আধিপত্যশীল শ্রেণি কর্তৃক নির্মিত মতাদর্শিক জ্ঞানের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য হলো, বিশেষ ধরনের জ্ঞান উৎপাদনের মধ্য দিয়ে প্রান্তিক শ্রেণির মানুষজনের প্রান্তিকতার কারণগুলোকে তাদেরই অন্তর্নিহিত (যা কিনা আধিপত্যশীল শ্রেণি কর্তৃক নির্মিত) গুণগতমানের সাথে জুড়ে দেয়া, যা অন্তত দুইভাবে সমস্যাজনক। প্রথমত, এর মাধ্যমে আধিপত্যের মতাদর্শিক চেহারাটাকে আড়ালে ঢেকে দেয়া হয়। আর দ্বিতীয়ত, এই প্রক্রিয়ায় আর কোনোভাবেই বৈষম্য/অসমতাকে/সমাজে প্রচলিত লিঙ্গীয় আচার-আচরণ ও সংশ্লিষ্ট চর্চাসমূহকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকে দেখবার মতো জায়গা থাকে না।

উপসংহার

নিবন্ধের পুরো আলোচনার প্রেক্ষাপটে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয় তা হলো, রোগ/অসুস্থতাকে/শরীরকে সংস্কৃতির একটা রূপক হিসেবে পাঠ করা গেলে বা ঐতিহাসিকভাবে প্রেক্ষিতকরণপূর্বক বিশ্লেষণ করা গেলে দেখা যায়, শরীর কেবল সংস্কৃতির একটা টেক্সটই নয়, বরং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটা প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক ক্ষেত্রও; যা নানা আঙ্গিকে নানাভাবে

নিয়ন্ত্রিত হয়। রোগ/অসুস্থতাকেন্দ্রিক মতাদর্শিক-লিঙ্গীয় রাজনীতির প্রক্রিয়ায় হিস্টেরিয়াগ্রস্ত নারীর শরীরে নারীত্বের বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করা হয়। অর্থাৎ অধিকতর সংখ্যায় নারীর আক্রান্ত হবার বিষয়টিকে নারীর প্রচলিত সামাজিক ইমেজের সাথে জুড়ে দিয়ে বর্ণনা করা হয়। এর মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে শরীর পরিণত হয় গ্রাফিক টেক্সটে এবং জেন্ডার বিষয়ক বিবৃতির আধারে পরিণত হয় শরীর—

> ...the woman's body becomes a surface on which conventional constructions of femininity are exposed. (Bordo 2003: 176)

আইনুন নাহার অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। anaher_ju@yahoo.com।
আলোকা তালুকদার গবেষক। alokatalukder@yahoo.com।